প্রান্তস্থ অর্থনীতিতে শিক্ষার বাজারীকরণ: বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে সাধারণভাবে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মূলনীতিটি হলো জনগণের জন্য ঠিক ততটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা করা যতটুকু পুঁজিপতিদের মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন। জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে পুঁজিবাদী সমাজের এই মূলনীতির কখনো কোনো পরিবর্তন না হলেও শিক্ষা খাতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। একটা সময় ছিল, যখন শিক্ষা খাত বিবেচিত হতো কেবল পুঁজিপতিদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক সরবরাহ করা (যাদের বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে খাটিয়ে তাঁরা মুনাফা করতে পারেন) এবং বিদ্যমান শোষণমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনমানস তৈরির মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু বর্তমান সময়ের পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায়, পুঁজিবাদীদের কাছে শিক্ষা খাত প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক সরবরাহ করা ও বিদ্যমান ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনমানস তৈরির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত তো হয়ই, এর সাথে যেটা যুক্ত হয়েছে তা হলো খোদ শিক্ষা খাতই এখন বিবেচিত হচ্ছে পুঁজি বিনিয়োগ তথা মুনাফা করার নতুন ক্ষেত্রে। শিক্ষা খাত নিয়ে পুঁজিপতিদের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের কারণ নিহিত আছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ কতগুলো পরিবর্তনের মধ্যে।

বর্তমানে দুনিয়ার সিংহভাগ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করছে হাতে গোনা কয়েকটি দৈত্যাকৃতির একচেটিয়া বহুজাতিক কর্পোরেশন। একচেটিয়া পুঁজি তার নিজের মুনাফার স্বার্থে পুরো বিশ্বকে নিজের মুঠোয় নিয়ে আসতে চায়। তাই দরকার দেশে দেশে বিশ্বায়নের নাম করে বাণিজ্য বাধাগুলো উঠিয়ে নেয়ার, বাজারের উপর থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়ার। একচেটিয়া পুঁজির এই তাগিদকে ধারণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে সত্তরের দশকে উদ্ভব ঘটল নব উদারবাদী অর্থশাস্ত্রের। প্রকৃতপক্ষে নব উদারবাদ হলো একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী একটি আর্থ-রাজনৈতিক মতবাদ। একচেটিয়া পুঁজি তার মুনাফার স্বার্থে দেশে দেশে বাজারের লাগাম ছেড়ে দেয়ার এই নিদানটি চাপিয়ে দিয়েছে। আর এ কাজে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তাদের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো বৈশ্বিক সংস্থাগুলো। নব উদারবাদ চায় সমাজের সবকিছুকেই বাজারের হাতে ছেড়ে দিতে। নব উদারবাদী মতাদর্শ প্রচার করে বাজারের অদৃশ্য হাত নিজে থেকেই বাজারকে ভারসাম্যে নিয়ে যাবে। নব উদারবাদের প্রবক্তারা জনকল্যাণমুখী খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাতে চান। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ জনকল্যাণমূলক খাতগুলোতে ভর্তুকি কমাতে চান। তাঁদের কাছে এগুলো হলো সার্ভিস, যেটা বাজার থেকে কিনে নিতে হবে। তাঁরা দ্রব্যমূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দিতে চান। তাঁরা ব্যাপকভাবে বেসরকারীকরণ করতে বলেন। এই বেসরকারীকরণের কবল থেকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ উত্তোলন থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যাংক, বীমা, পানি সরবরাহ, টেলিফোন, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা–কোনো কিছুই বাদ যায় না। অর্থাৎ সবকিছুকেই একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার ক্ষেত্র হিসেবে খুলে দিতে হবে। অন্যদিকে সবকিছুকে এভাবে বাজারের হাতে তুলে দেয়া কখনোই শান্তিপূর্ণ হয় না। এ কারণে দেখা গেছে, এসব সংস্কার চালানো হয়েছে সেনাবাহিনী, মুষ্টিমেয়র স্বার্থ রক্ষাকারী রাজনীতিবিদ আর ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে।

একচেটিয়া পুঁজি স্থবিরতা থেকে বাঁচতে নতুন নতুন যেসব খাতের দিকে হাত বাড়িয়েছে, শিক্ষা খাত তার মধ্যে অন্যতম। অর্থাৎ এই একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে পুঁজি খোদ শিক্ষা খাতকেই মুনাফা বানাবার নতুন ক্ষেত্রে পরিণত করেছে এবং আরো করতে চাচ্ছে। ২০১৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে বৈশ্বিক শিক্ষার বাজারের আকার এখন ৪.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। জন বেলামি ফস্টারমান্থলি রিভিউর ২০১১ সালের জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'এডুকেশন অ্যান্ড দ্য স্ট্রাকচারাল ক্রাইসিস অব ক্যাপিটাল' নিবন্ধে লিখেছেন, "উন্নত অর্থনীতিগুলোতে ছড়িয়ে পড়া ধীর প্রবৃদ্ধির একটি পরিণতি হলো এই যে, আজকের অর্থনৈতিক দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা দানবীয় কর্পোরেশনগুলো তাদের প্রথাগত কার্যক্ষেত্রের বাইরে এসে বিনিয়োগের জন্য নতুন নতুন বাজার খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে, যা ধাবিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রধান উপাদানগুলোকে দখল করা এবং বেসরকারীকরণ করার দিকে।...বেসরকারি শিক্ষার শিল্পটি, মূলধন সংবর্ধনের প্রয়োজনে আরো একটি কয়েক ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক সরকারি শিক্ষাবাজার খুলে দেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।" (এই অংশটুকুর অনুবাদ লেখকের নিজস্ব)। ফস্টার উক্ত প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন পাবলিক স্কুলগুলোতে কিভাবে নতুন করে কর্পোরেট আক্রমণ চলছে, অতীতে কিভাবে আক্রমণের চেষ্টা চলেছিল, তার সাথে একচেটিয়া পুঁজির সম্পর্ক। তার বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা হয়েছে, সেটার বিস্তারিত বিবরণও ফস্টারের উক্ত নিবন্ধে উঠে এসেছে।

অন্যদিকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রান্তস্থ অর্থনীতির একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও গত তিন দশক ধরে চলছে নব উদারবাদী মতাদর্শের ধারাবাহিক বাস্তবায়ন। আর এর আওতায় কেন্দ্রস্থ দেশের মতো বাংলাদেশেও চলছে শিক্ষার ক্রমাগত বাজারীকরণ। তবে কেন্দ্রস্থ অর্থনীতির কোনো দেশের শিক্ষার বাজারীকরণের সাথে বাংলাদেশের মতো প্রান্তস্থ অর্থনীতির একটি দেশের শিক্ষার বাজারীকরণের পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশে শাসনক্ষমতায় একটি লুটেরা শাসকশ্রেণি থাকার কারণে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বাজারীকরণের সাথে যুক্ত হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরাসরি লুণ্ঠন। এ দুইয়ের মিলিত ফলাফল বাংলাদেশের জনগণের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থাটি আরো ভয়াবহ রকমের সঙ্গিন করে তুলছে।

শিক্ষা নিয়ে সরকারি তৎপরতা: কয়েকটি সংবাদ

এ বছরের আগস্ট মাসে খোদ রাজধানীতে দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভেঙে দেয় প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবানরা। বেইলি রোডে অবস্থিত সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র নামের ৫২ বছরের পুরনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ঈদের ছুটির সুযোগে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের হর্তাকর্তাদের নির্দেশে। বিদ্যালয়টিতে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের সবাই ছিল শ্রমজীবী ও গরিব ঘরের সন্তান। বিদ্যালয়টির জায়গা নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে অনেক বছর ধরে

বিরোধ চলছিল গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের। আদালতের রায়কে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাকের ডগায়, মন্ত্রণালয় থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ভেঙে ফেলার সাহস দেখাল গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন (প্রথম আলো, ৯ ও ১২ আগস্ট ২০১৪)।

এক্ষেত্রে বিদ্যালয়টির অতীত ইতিহাসের কিছুটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেন সে ব্যাপারে একটু পরে আসছি। গত মার্চ মাসে দৈনিক প্রথম আলোতে এ বিদ্যালয়টি নিয়ে প্রকাশিত হওয়া প্রতিবেদনে যা উঠে আসে তা হলো : বিদ্যালয়টি ১৯৬২ সালে গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৭৩ সালে এটিকে জাতীয়করণ করে তৎকালীন সরকার। এরপর ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু হয় বিদ্যালয়টিকে অন্য জায়গায় সরানোর জন্য গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের তৎপরতা। বিদ্যালয়টির জায়গা দখল করতে মামলা করে তারা। বিদ্যালয়টি নিয়ে শুরু হয় অ্যাসোসিয়েশন আর মন্ত্রণালয়ের টানাটানি। অন্যদিকে এসব আমলাতান্ত্রিক টানাটানির খপ্পরে পড়ে দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যালয়ের কোনো উন্নয়ন না হওয়ায় বিদ্যালয়টি হয়ে পড়ে জরাজীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী। আগে বিদ্যালয়টিতে কয়েকশ' শিক্ষার্থী থাকলেও বর্তমানে সেখানে শিক্ষার্থী মাত্র ৪৩ জন। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে প্রথম আলোর প্রতিবেদক সেখানে গিয়ে দেখেছিলেন, ভাঙাচোরা দুটি কক্ষে বিদ্যালয়ের ক্লাস হচ্ছে। দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়া, শ্রেণিকক্ষের ছাদের টিনের চাল ভেঙে পড়েছে, সেখানে শামিয়ানা টানানো। বিদ্যালয়টিতে ছিল না কোনো শৌচাগার। এমনকি বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থাও ছিল না (প্রথম আলো, ১৪ মার্চ ২০১৪)।

অন্যদিকে ৪২ বছরের পুরনো মিরপুরের চম্পা পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে দিনে-দুপুরে প্রবেশ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বের করে দিয়ে বিদ্যালয়ের ক্লাসরুম ভেঙে দেয় স্থানীয় প্রভাবশালী ও সন্ত্রাসীরা। দখল করে নেয় বিদ্যালয়ের মাঠটি। আদালতের রায়কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে স্কুল উচ্ছেদে কাজে লাগানো হয় পুলিশ বাহিনীকেও। (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৯ আগস্ট ২০১৪)। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা নিয়ে ঢাকা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের তৈরি করা একটি প্রতিবেদন গত ১৯ আগস্ট প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে জমা দেয়া হয়। উক্ত প্রতিবেদনে যা উঠে আসে তা হলো : ঢাকা শহরের ৩৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮টি বিদ্যালয়েরই জমি ও শ্রেণিকক্ষ বেদখল হয়ে গেছে। দখলকৃত জমির মোট পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাত বিঘা। এই দখল কার্যক্রম ঘটেছে ১০-১৫ বছর ধরে, প্রশাসনের নাকের ডগায়। বেদখল হওয়া বিদ্যালয়গুলোর কোনোটিতে বিদ্যালয় ভবনে দোকান নির্মাণ করা হয়েছে, বিলবোর্ড লাগানো হয়েছে, কোথাও আবার নির্মাণ করা হয়েছে বহুতল ভবন। কোনোটিতে বস্তি নির্মাণ করে আবাসন ব্যবসা চলছে, কোনো কোনোটিকে আবার কমিউনিটি সেন্টারে পরিণত করা হয়েছে। একটিতে বানানো হয়েছে গাড়ি রাখার গ্যারেজ। এমনকি একটি বিদ্যালয়কে বন্ধ করে দিয়ে বসানো হয়েছে ছাগলের স্থায়ী হাট ও পশু জবাইখানা। আরো একটি বিদ্যালয় দখল হওয়ার পথে। দখলদারদের তালিকা বড়ই বিচিত্র। স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর সাথে যুক্ত প্রভাবশালীরা তো আছেই, এমনকি ঢাকা ওয়াসা পর্যন্ত রয়েছে বিদ্যালয়ের জমি দখলকারীর তালিকায়। দখলদারদের তালিকায় আরো রয়েছে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের ক্ষমতাকাঠামোর সাথে যুক্ত পঞ্চায়েত কমিটি, এনজিও, ক্লাব, ট্রাক মালিক সমিতি, 'মহিলা সমিতি', 'স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন' ইত্যাদি। শুধু তা-ই নয়, কিছু কিছু বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে দখলকারীর তালিকায়। অপেক্ষাকৃত সচ্ছলদের জন্য তৈরি এসব বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেয়ে ফেলেছে 'গরিবের স্কুল'খ্যাত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি ও ক্লাসরুম (প্রথম আলো, ২৩ আগস্ট ২০১৪ এবং সকালের খবর, ২২ আগস্ট ২০১৪)।

ঢাকা শহরের ৩৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮টি বিদ্যালয়েরই জমি ও শ্রেণিকক্ষ বেদখল হয়ে গেছে। দখলকৃত জমির মোট পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাত বিঘা। এই দখল কার্যক্রম ঘটেছে ১০-১৫ বছর ধরে, প্রশাসনের নাকের ডগায়। বেদখল হওয়া বিদ্যালয়গুলোর কোনোটিতে বিদ্যালয় ভবনে দোকান নির্মাণ করা হয়েছে, বিলবোর্ড লাগানো হয়েছে, কোথাও আবার নির্মাণ করা হয়েছে বহুতল ভবন।

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনগুলো সাক্ষ্য দেয় কিভাবে এদেশের জনগণের শিক্ষাকে হাত-পা বেঁধে বাজারের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। কিভাবে রাষ্ট্রের অবহেলার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থ নির্ধারণ করে দিচ্ছে কোন স্কুলটি টিকে থাকবে আর কোনটিকে ভেঙে ফেলা হবে। এগুলো দেখিয়ে দেয় কিভাবে জনগণের শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিনের পর দিন ধসিয়ে দিয়ে পথ পরিষ্কার করা হচ্ছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। একই সাথে এগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এদেশের লুণ্ঠনজীবী শাসকশ্রেণির কাছে জনগণের শিক্ষা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো এটিও দেখিয়ে দেয় যে শাসন ক্ষমতায় যখন লুটেরারা থাকে তখন তাদের নগ্ন লুণ্ঠনের হাত থেকে বিদ্যালয়ও বাদ যায় না। সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী হয় তাদের লুণ্ঠন। সামগ্রিকভাবে উক্ত প্রতিবেদনগুলো প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্র সম্পর্কিত হলেও এগুলো বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা ক্ষেত্রে যা ঘটেছে ও ঘটে চলেছে, তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর তা হলো শিক্ষার বাজারীকরণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে লুণ্ঠন। শিক্ষার বাজারীকরণ বিশ্বব্যাপীই চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধও তাই বিশ্বব্যাপী। কিন্তু বাংলাদেশে লুটেরা শাসকশ্রেণির কল্যাণে এই বাজারীকরণ এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। শিক্ষা এদেশে এখন দ্রুত টাকা বানানোর একটা খাতে পরিণত হতে চলেছে।

বাংলাদেশের মিডিয়াতে শিক্ষার দৈন্যদশার খবর ভালোভাবে উঠে এলেও এর কার্যকারণ নিয়ে তেমন কোনো খবর সেখানে নেই। সামগ্রিক শিক্ষার বাজারীকরণ সংক্রান্ত খবর তাই সেখানে খুব কম প্রাধান্য পায়। যতটুকুও বা স্থান পায়, সেখানে একচেটিয়া দখল উচ্চশিক্ষার বাজারীকরণ সংক্রান্ত আলোচনার। এখানে শিক্ষার বাজারীকরণের আলোচনার মানে দাঁড়িয়েছে কেবল উচ্চশিক্ষার বাজারীকরণে তথা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজারীকরণে। কিন্তু শিক্ষার বাজারীকরণ কি কেবল উচ্চশিক্ষাতেই? এক্ষেত্রে প্রগতিশীল বলে পরিচিত মহলেও শিক্ষার বাজারীকরণ সংক্রান্ত আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে কেবল উচ্চশিক্ষার বাজারীকরণ। উচ্চশিক্ষার বাজারীকরণ নিয়ে কথা বলা, আন্দোলন গড়ে তোলা অবশ্যই দরকার। কিন্তু এর সমালোচনা করতে গিয়ে যেভাবে বলা হয় যে গরিবের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রবেশের রাস্তা বন্ধ করা হচ্ছে, সেই কথার মধ্যে একটা ত্রুটি রয়েছে। কারণ বাংলাদেশে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মজুরের সন্তানদের পক্ষে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তো দূরের কথা, সেখানে ভর্তি হতেই যে রেজাল্ট লাগে সেটি অর্জন করা সম্ভব নয় প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার সর্বব্যাপী বাজারীকরণের ফলে। কারণ এই রেজাল্ট বর্তমানে পুরোপুরি বাজার থেকে কিনে নেয়ার একটি বিষয়, যা কেনা শুরু করতে হয় প্রাথমিক স্তর থেকেই, নয়তো প্রতিযোগিতায় ছিটকে পড়তে হয়। গুটিকয়েক গরিবের সন্তান তার পরও বাধা ডিঙিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারলেও সেগুলো ব্যতিক্রম। উচ্চশিক্ষার বাজারীকরণের ইস্যুটি তাই কার্যত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তদের ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। কাজেই যারা মুখে শিক্ষা ক্ষেত্রে মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষার কথা বলেন, তাঁদের কেন কাজের সময় স্রেফ উচ্চশিক্ষার বাজারীকরণের বিরোধিতাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়, কেন তাঁদের নিচের স্তরের মেহনতিদের শিক্ষার বাজারীকরণ নিয়ে এত কম আলোচনা ও আন্দোলন করতে দেখা যায়, সে প্রশ্নের উত্তর দরকার।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে শিক্ষার বাজারীকরণ ঘটেছে সর্বক্ষেত্রে। নিচের স্তরের শিক্ষার বাজারীকরণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন চলছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও বাজারের হাতে তুলে দেয়ার কাজ। এই বাজারীকরণের মাত্রা আরো তীব্র করতে শাসকশ্রেণি বর্তমানে ব্যবহার করছে নানা রকম হাতিয়ার। এই রাষ্ট্র গত ৪৩ বছর ধরে জনগণের শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যত হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে। এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকার ফলে শুরু থেকেই শিক্ষাকে বাজারের উপর ছেড়ে দেয়ার ঝোঁক ছিল প্রবল।

তথ্যগুলো কথা বলে

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) প্রকাশনা Statistics on Primary Education 1947 to 1983 অনুযায়ী, স্বাধীনতার ঠিক আগের বছর দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২৬,৩৯৯টি। স্বাধীনতার পর অবস্থার চাপে পড়ে জাতীয়করণের পর ১৯৭৪ সালে এসে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬,১৬৫টিতে। তখন মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৯ শতাংশই সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ব্যানবেইসের আরেকটি প্রকাশনা Primary Education in Bangladesh (January 1987)-এর তথ্যানুসারে, ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়ে নতুন ৫৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে একই সময়ে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধি পায় ৭,০৩৪টি। বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে প্রবেশকৃত) তথ্য থেকে হিসাব করলে দেখা যায়, ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে আরো ১,০১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে একই সময়ে বিভিন্ন ধারার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় মোট ৩৫,৬০৬টি। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৯৬ সালেই সর্বোচ্চসংখ্যক ৩৭,৭১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কেননা ১৯৯৬ সালের পরবর্তী ১৬ বছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে উল্টো ৩৮টি বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে একই সময়ে বিভিন্ন ধারার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে ২৩,২৩৭টি।

ব্যানবেইসের প্রকাশনা Bangladesh Education Statistics 2012 অনুসারে, ২০১২ সালে মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭,৬৭২টি আর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (এবতেদায়িসহ) ছিল ৬৬,৩৪৫টি। অর্থাৎ বর্তমানে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৩৬ শতাংশ সরকারি আর ৬৪ শতাংশই বেসরকারি। যদিও এখন পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদালয়গুলোর মোট শিক্ষার্থীসংখ্যা বেসরকারিগুলোর মোট শিক্ষার্থীসংখ্যার চেয়ে বেশি। কিন্তু বেসরকারি খাতের অধীনেও রয়েছে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীসংখ্যা প্রায় ১ কোটি সাড়ে ৭ লাখ। বেসরকারিগুলোতে শিক্ষার্থীসংখ্যা সাড়ে ৮২ লাখ। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের প্রায় ৪৩ শতাংশ শিক্ষার্থী এখন বেসরকারি খাতের অধীন। ২০১৩ সালে নতুন করে যেসব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা এসেছে সেটি কার্যকর হওয়ার পরও বিপুলসংখ্যক বিদ্যালয় বেসরকারি খাতের আওতায় থেকে যাবে।

লক্ষণীয়, যেখানে ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা খাতের পুরোটাই রাষ্ট্রের দায়িত্বে চলে এসেছিল, সেখান থেকে কিভাবে দশকের পর দশক ধরে এই খাতে বেসরকারি খাতের প্রাধান্য স্থাপন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে তিন ধারার ১৫ রকমের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব বহন করার কথা রাষ্ট্রের। শুধু তা-ই নয়, সংবিধানে এটাও বলা হয়েছে যে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা হবে এক ধারার, এক রকমের। শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক দলগুলো, তাদের বুদ্ধিজীবীরা, মূলধারার মিডিয়ায় সংবিধানে কী বলা আছে আর কী বলা নেই, সেসব নিয়ে প্রচুর বাক্য ব্যয় করে। কিন্তু সরকারগুলো এ রকম সুস্পষ্টভাবে দশকের পর দশক ধরে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধান লঙ্ঘন করে এলেও সংবিধানের এই লঙ্ঘন নিয়ে তাদের কখনো কোনো রকম উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় না। কারণটি মোটেও অরাজনৈতিক নয়।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যতগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে সিংহভাগই জাতীয়কৃত। ২০১৩ সালে আন্দোলনের মুখে সরকার নতুন করে ২৬,২০০ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় করে। এটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে বেসরকারি খাতে আরো কিছু শিক্ষার্থী কমবে। কিন্তু এভাবে জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকার কৃতিত্ব নেয়ার চেষ্টা করলেও এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি যে প্রশ্নটি তোলা দরকার তা হলো, যেখানে ১৯৭৪ সালে ৯৯ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ই সরকারি হয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে কেন ৪০ বছর পর এসে এত বিপুলসংখ্যক বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করতে হলো? এত বিপুলসংখ্যক বেসরকারি বিদ্যালয় তৈরি হওয়ার সুযোগ পেল কী করে? কেন সময় থাকতে নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হলো না? সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে জাতীয়কৃত বিদ্যালয়গুলোকে বাদ দিলে দেখা যাবে, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সরকারগুলো নিজ উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় মাত্র ১,৫৪৫টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। ২০১২ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয়প্রতি শিক্ষার্থীসংখ্যার অনুপাতটি বিবেচনায় নিলে বলা যায়, এই চার দশকে সরকারগুলো মাত্র সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থীর জন্য পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছে।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকার পরও যে

রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এমনভাবে হাত গুটিয়ে বসে থেকে সেটিকে বাজারের হাতে তুলে দিতে পারে, তারা অন্যান্য স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে সচল হবে তেমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আর সেটা হয়ওনি। ব্যানবেইসের ওয়েবসাইটে (২৬ আগস্ট ২০১৪ তারিখে প্রবেশকৃত) দেয়া তথ্যানুসারে, ১৯৮০ সালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৭৫টি আর বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬,৩০১টি। ১৯৮০-২০১২ এই ৩২ বছরে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেড়েছে ১৪৩টি আর বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেড়েছে ৯,৭২০টি। ২০১২ সালের হিসাবে ১৬,৩৩৯টি মাধমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাত্র ৩১৮টি। অন্যদিকে এই ৩১৮টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সবকটিই ২২ বছর বা তারও আগে স্থাপিত। কারণ ১৯৯২-২০১২ এই ২০ বছরে গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক পাঁচটি সরকার মিলে নতুন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে মাত্র দুটি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার চার দশক পর এসেও মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিকের মোট ৭৯ লাখ ৩৭ হাজারের কিছু বেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে রাষ্ট্র দায়িত্ব নিয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর (প্রায় ২ লাখ ৬১ হাজার জন)।

ব্যানবেইসের প্রকাশনা Government Colleges in Bangladesh, June 1982 অনুসারে, ১৯৭১ সালের আগে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল একটি। ১৯৭১-১৯৮২ পর্যন্ত সময়ে আরো দুটি সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮২ সালের ২৬৬টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মধ্যে তিনটি ছিল সরকারি। এর ৩০ বছর পর এসে অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (২৬ আগস্ট ২০১৪ তারিখে প্রবেশকৃত) দেয়া তথ্যানুসারে, ২০১২ সালে এসে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮টিতে। অন্যদিকে বেসরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৮৯৮টিতে। অর্থাৎ চার দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাষ্ট্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশের দায়িত্ব নিয়েছে (২১,৪৮০ জন)।

এদিকে শিক্ষার বাজারীকরণ সংক্রান্ত আলোচনায় উচ্চশিক্ষার বাজারীকরণই বেশির ভাগ সময় প্রাধান্য পেয়ে থাকলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেয়ার হারটি তুলনামূলকভাবে ভালো। যদিও উচ্চশিক্ষার বাজারীকরণ ঘটছে অন্যভাবে। কিন্তু সে আলোচনায় একটু পর আসা যাবে। আপাতত প্রতিষ্ঠানের তথ্যগুলো দেখা যাক। একই প্রকাশনা অনুসারে, ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছিল ৯৮টি। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্যানুসারে, বর্তমানে মোট ১,৪৮৮টি ডিগ্রি কলেজের মধ্যে (পাস ও অনার্স উভয়) সরকারি ডিগ্রি কলেজ ১৭৪টি। বর্তমানে ডিগ্রি পর্যায়ের (পাস ও অনার্স উভয়) ১২ লাখ ১০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে সরকার দায়িত্বে নিয়েছে ৪ লাখের কিছু বেশি অর্থাৎ ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থীর। বিভিন্ন মাস্টার্স কলেজে অধ্যয়নরতদের ৮৭ শতাংশই সরকারি মাস্টার্স কলেজগুলোর শিক্ষার্থী।

অন্যদিকে বর্তমানে দেশের ৮৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫২টিই বেসরকারি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হু হু করে বেড়ে চললেও এখন পর্যন্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যলয়গুলোতেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। যদিও এই বেসরকারি

২০১২ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয়প্রতি শিক্ষার্থীসংখ্যার অনুপাতটি বিবেচনায় নিলে বলা যায়, এই চার দশকে সরকারগুলো মাত্র সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থীর জন্য পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য অনুসারে, ২০১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রায় ৬ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৩ শতাংশ হলো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থী। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেকই বেসরকারি খাতের অধীন।

শিক্ষার বাজারীকরণের পরোক্ষ প্রক্রিয়া এবং লুণ্ঠন

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরকারি আর বেসরকারি অংশের যে বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে সেটি হলো বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাকে কী করে প্রত্যক্ষভাবে বাজারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে তার উদাহরণ। কিন্তু এটি শিক্ষার বাজারীকরণের কেবল একটি দিক মাত্র। বাজারীকরণের আরো একটি দিক রয়েছে। তা হলো তার পরোক্ষ দিক। পরোক্ষ দিক হলেও এই দিকটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপকতর। পরোক্ষভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাকে বাজারের হাতে তুলে দেয়ার যে ধরন তা স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের জন্য এক রকম। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আরেক রকম।

স্কুল ও কলেজ পর্যায় : এদেশের লুণ্ঠনজীবী শাসকশ্রেণি জনগণের জন্য এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করেছে, যেখানে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষাকে বাজারের হাতে তুলে দিচ্ছে খোদ শিক্ষাব্যবস্থাটিই। এর আঁচ শাসকশ্রেণির গায়ে লাগে না। তার কারণ তাদের সন্তানরা সাধারণত পড়ে বিদেশি কারিকুলামের ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে, নয়তো সরাসরি বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে আসে। দেশের ভেতরে যত উচ্চমূল্যেই হোক কিংবা বিদেশে গিয়ে হোক, মানসম্মত শিক্ষাটা তাদের সন্তানরা হয়তো ঠিকই অর্জন করে।

একদিকে যত দিন যাচ্ছে ততই এই স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো ক্রমাগত দুর্বোধ্য করে তোলা হচ্ছে। সংস্কারের নামে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম আবর্জনাতুল্য উপাদান তাতে অন্তর্ভুক্ত করে একের পর এক সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তকের মান আরো বেশি করে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা সাম্প্রতিক সময়ে স্কুল পর্যায়ে চাররঙা করার নামে যেসব নিম্ন রুচির পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আরো বেশি করে সত্য। একই অবস্থা ইন্টারমিডিয়েটের পাঠ্যপুস্তকেও। সাম্প্রতিক 'সৃজনশীল' পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সৃজনশীলতা কোণঠাসা করবার আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করার নামে বহু আবর্জনাতুল্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে যাওয়া হচ্ছে। একগাদা অপ্রয়োজনীয় বিষয় দিয়ে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাথায় বোঝা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে এমনভাবে, যাতে তাদের সব সময় একটা তাড়ার মধ্যে থাকতে হয়। যার ফল হলো, শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা আরও সংকুচিত হওয়া। মাসিক 'সংস্কৃতি' পত্রিকার আগস্ট ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত ফারুক আহমেদের 'স্কুল পাঠ্যক্রমে পশ্চাৎপদ ও সামন্তীয় ধারণা টিকিয়ে রাখার আয়োজন' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে এ বিষয়ে সাম্প্রতিক অবস্থার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে স্কুল ও কলেজগুলোর শিক্ষক সংকট, যোগ্য শিক্ষকের প্রকট অভাব ও শিক্ষা উপকরণের অভাব। বেশির ভাগ স্কুলে নেই কোনো ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি। একই সাথে যুক্ত হয়েছে শিক্ষকদের পাঠদানে অবহেলা। যার

প্রধান কারণ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম বেতন দেয়া এবং দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অযোগ্য লোককে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া। শিক্ষকের বেতন কতটা কম? একটি ছোট্ট তথ্য দেয়া যাক। সাম্প্রতিক বেতন বৃদ্ধির পরও বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক মাসে ১১,২৩৫ টাকা পান। অন্যদিকে ঢাকা ট্রিবিউনের গত বছরের ৫ অক্টোবরের একটি রিপোর্ট বলছে, একজন সরকারি ড্রাইভার মাসে ওভারটাইমসহ ১৩,০০০ টাকা আয় করতে পারেন। উল্লেখ্য, বেসরকারি স্কুল বা সরকারি-বেসরকারি কলেজেও শিক্ষকের বেতনও এর থেকে খুব বেশি নয়।

এর সাথে সাথে শাসকশ্রেণি এমন ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করে রেখেছে, যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে শুধু স্কুলের সহায়তার প্রস্তুতি গ্রহণ সম্ভব না হয়। আর এই সবকিছুর সাথে যুক্ত হয়েছে সরকারি স্কুল ও কলেজের প্রতি রাষ্ট্রীয় অবহেলা এবং বেসরকারিগুলোর প্রতি কার্যত কোনো নজরদারি না রাখা। রাষ্ট্রীয় অবহেলার বিষয়ে এই প্রবন্ধের শুরুতেই যেসব সংবাদের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোই যথেষ্ট হলেও নতুন আরো কিছু নমুনা দেখা যাক। অনলাইন সংবাদমাধ্যম নতুন বার্তা ডটকম গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের এক প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বরাত দিয়ে খবর দিচ্ছে যে সারা দেশে ১০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই কাজ চালাচ্ছে। অন্যদিকে দৈনিক প্রথম আলোতে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন বলছে, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদানকে সংকটে ফেলে দিয়েছে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের কারণে সৃষ্ট আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় দেশের ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২১৩টিতেই প্রধান শিক্ষকের পদ ফাঁকা পড়ে আছে। শুধু তা-ই নয়, এর পাশাপাশি এসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১,৫৩২টি সহকারী শিক্ষকের পদও ফাঁকা পড়ে আছে। যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষাদান। এগুলোর চাইতে ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত আর কিছু হতে পারে কি?

কাজেই এই সবকটি ঘটনার মিলিত ফল হিসেবে শিক্ষার্থীরা বাধ্য হচ্ছে নোট-গাইড বই এবং প্রাইভেট টিউটর-কোচিং সেন্টারের সাহায্য নিতে। সোজা কথায় সরকারি হোক কি বেসরকারি, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সব ধরনের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরই কার্যত বাজার থেকে শিক্ষাকে কিনে নিতে হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যারা পড়ে তাদের বেতন ও অন্যান্য ফি বাবদ সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের থেকে কিছু বেশি দিতে হয়, এই যা পার্থক্য। এক্ষেত্রে যার অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্য বেশি, তার পক্ষে সম্ভব হয় বাজার থেকে সেরা সেরা প্রাইভেট টিউটরের সেবাগুলো কিনে নেয়া। যাঁদের সামর্থ্য কম, তাঁদের সন্তানরা যায় অলিতে-গলিতে গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারগুলোতে, আর যাঁদের সামর্থ্য আরো কম তাঁদের সন্তানরা কোনোমতে একটা গাইড বই আর সাজেশন জোগাড় করে পাস করার ব্যবস্থা করে। আর যাদের সেই সামর্থ্যও নেই, শিক্ষা তাদের জন্য কার্যত নিষিদ্ধ। কোনোমতে তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়তে পারলেও পঞ্চম শ্রেণিতে এসেই তারা ঝরে পড়ে। বাংলাদেশে এখন এটাই ঘটছে।

তবে এক্ষেত্রে যে কথাটা উল্লেখ করা দরকার তা হলো, নোটবই আর প্রাইভেট টিউটরের উপর তথা বাজারের উপর শিক্ষার্থীদের নির্ভরতা আগেও দেখা গেলেও সেটা এরকম সর্বজনীন ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে পিএসসি ও জেএসসির মতো অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা চালু ও সৃজনশীলতার ধ্বংসের যাবতীয় আয়োজন করে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করার পর প্রাইভেট টিউটর, কোচিং সেন্টার আর নোট-গাইডের উপর শিক্ষার্থীদের নির্ভরতা আক্ষরিক অর্থেই সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। অথচ সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল একথা বলে যে এটি নোট বই-প্রাইভেট টিউটরের উপর নির্ভরতা কমাবে! কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, খোদ শিক্ষকরাই ভালো করে এখনো জানেন না এই পদ্ধতিতে কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে। ২০১৩ সালে সারা দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের উপর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের চালানো অনুসন্ধান থেকে বেরিয়ে আসে, দেশের মাত্র ৫৬ শতাংশ স্কুল সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে সক্ষম (যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ২০১৩)।

বাস্তবে এসব সংস্কারের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতির অবস্থা এতটাই সঙ্গিন করে তোলা হয়েছে যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম রেজাল্ট করতে হলেও এখন প্রাইভেট টিউটর ও কোচিং সেন্টারের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। সার্বিকভাবে তৈরি করা হয়েছে এক ভয়াবহ নৈরাজ্য। এমনকি গ্রামাঞ্চলে ও শহরের প্রান্তিক অবস্থার স্কুল ও কলেজগুলোতে ন্যূনতম পাস করার জন্যই এখন নোট-গাইড লাগছে। এভাবে কি সরকারি কি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকেই বাজার থেকে প্রাইভেট টিউটর আর নোট বইয়ের এই 'বাড়তি শিক্ষা' কিনতে বাধ্য করার জন্য প্রতিবছর কত শত কোটি টাকা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের পকেট থেকে চলে যাচ্ছে তার হিসাব কে করবে? এই অর্থ কি তাদের খরচ করার কথা ছিল? এভাবে তাদের লুণ্ঠিত হওয়ার জন্য দায়ী কারা? অবস্থাটা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে বর্তমানে শিক্ষার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিজের পকেট থেকে মাসে যতটা খরচ করতে হচ্ছে, নিচের স্তরের স্কুল ও কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম মানের রেজাল্ট করতে হলেও খরচ করতে হচ্ছে তার থেকে অনেক অনেক বেশি। বর্তমানে প্রাইভেট টিউটর আর কোচিং সেন্টারের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা প্রধানত শিক্ষা লাভ করছে। স্কুল ও কলেজ হয়ে পড়েছে নিছক সার্টিফিকেট প্রদান করার কেন্দ্র। এ বিষয়ে কুমিল্লা, ফেনী ও নোয়াখালীর মাইজদী শহরে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, সৃজনশীল পদ্ধতি আসার পর থেকে গত পাঁচ বছরে ঐসব অঞ্চলে নোট-গাইড বই বিক্রির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, অবস্থা এতটাই সঙ্গিন যে বর্তমানে প্রথম শ্রেণির জন্যও গাইড বই বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে খোদ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা পরিণত হয়েছেন নোট বই কোম্পানির এজেন্টে। স্কুল ও মাদ্রাসাগুলো নিজেরাই শিক্ষার্থীদের নির্ধারণ করে দিচ্ছে কোন কোম্পানির নোট বই কিনতে হবে। কোম্পানিগুলো এখন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাধ্যমে সরাসরি বিদ্যালয়ে বা মাদ্রাসায় গিয়ে নোট-গাইড বিক্রি করছে। অনলাইন সাপ্তাহিক আমাদের বুধবার পত্রিকায় ৬ মে ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত 'প্রাথমিক শিক্ষাও বাজারীকরণ (পর্ব-৮)' শিরোনামের লেখাটিতে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। সারা দেশের চিত্র এই তিন জেলার থেকে যে ভিন্ন নয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই যেমন জানেন, তেমনি তার প্রমাণ পত্রিকাগুলোতেও হরহামেশাই আসছে।

স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার এই পরোক্ষ কিন্তু সর্বাঙ্গীণ বাজারীকরণের পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি স্কুল ও কলেজগুলোতে চলছে ভর্তি বাণিজ্য। এটা সবচেয়ে বেশি করছে রাজধানীর নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলো। অন্যান্য বেসরকারি স্কুল ও কলেজের

ইচ্ছেমতো বেতন-ফি নেয়ার খবরও আসে পত্রিকায়। স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামো এই লুণ্ঠনের সাথে যে ভালোভাবেই জড়িত তার খবর পত্রপত্রিকায় প্রতিবছরই আসছে। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী ও সরকার বিনা মূল্যে সময়মতো বই বিতরণের সাধারণ দায়িত্ব পালনটিকে মহা কৃতিত্ব হিসেবে জাহির করলেও এক্ষেত্রে লুণ্ঠনটিকে ঢাকতে পারছে না। একগাদা অপ্রয়োজনীয় বিষয় সৃষ্টি করে কোটি কোটি বই ছাপতে যে বিপুল পরিমাণ জনগণের অর্থ খরচ হচ্ছে প্রতিবছর তা কাদের পকেটে যাচ্ছে সেটিও একটি অনুসন্ধানের বিষয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য যে কোচিং বাণিজ্য হয়, সেটিও কার্যত দ্রুত টাকা বানানোর আরেকটি ক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। কতগুলো হাতে গোনা কোচিং সেন্টারের যে রমরমা অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে আগামীতে তা যে আরো তীব্র হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উচ্চশিক্ষা পর্যায় : প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হচ্ছেন ডিগ্রি কলেজে অধ্যয়নরত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালেয়র অধীনে অনার্স অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও। এই শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন উচ্চ বেতন দিতে হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই কোর্স শেষ করে দেবেন এমন চুক্তিতে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে হয় সাজেশনের জন্য, নোটের জন্য। কি মফস্বল, কি শহরাঞ্চল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এটি এখন একটি অলিখিত নিয়মের পর্যায়ে চলে গেছে। বিশেষ করে যেসব বিষয় অপেক্ষাকৃত কঠিন, সেসব বিষয়ে অবস্থাটা এমন যে প্রাইভেট না পড়লে পাস করাটাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। ফলে তাঁদেরও কার্যত বাজার থেকেই শিক্ষাটা কিনে নিতে হচ্ছে।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার বাজারীকরণ ঘটছে অন্যভাবে। এখনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই অপেক্ষাকৃত বেশি শিক্ষার্থী পড়লেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে বাড়ানো হচ্ছে ক্রমাগতভাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্যানুসারে, বর্তমানে ৫২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কার্যক্রম চালানোর অনুমোদন পেয়েছে আরো ২৭টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। এভাবে গণহারে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে সরকার থেকে যে যুক্তি প্রচার করা হয় তা হলো, উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য এটি দরকার। এদিকে গত ২৭ আগস্ট ২০১৪ তারিখে ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Intake at public univs exceeds capacity' শীর্ষক প্রতিবেদনে ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়ের যে তথ্য উঠে আসে তাতে দেখা যায়, বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসনসংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে বিপুলসংখ্যক আসন ফাঁকা পড়ে থাকছে। ২০১২ সালের হিসাবে দেখা যায়, ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীসংখ্যা ধারণক্ষমতার থেকে ৩২০ জন বেশি হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে ৮১,১৪৪টি আসন ফাঁকা পড়ে আছে। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট ৫০,৫০২টি আসন ফাঁকা পড়ে আছে। গণহারে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের যে যুক্তি দেয়া হয়, সেটি যে বর্তমানে গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়, উপরের তথ্যগুলো তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাহলে এভাবে আসন ফাঁকা পড়ে থাকার পরও আরো নতুন ২৭টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমতি দেয়ার কারণ কী? বাস্তবে উচ্চশিক্ষা খাতকে সরাসরি লুণ্ঠনের এক নতুন ক্ষেত্রে পরিণত করা, উচ্চশিক্ষাকে অতি দ্রুত টাকা বানানোর একটা ক্ষেত্রে পরিণত করার নীতিই এখন কার্যকর। বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার নামে যা দিচ্ছে তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ২০২৬ সালের মধ্যে তাদের মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ নিজেদের অর্থায়নে করতে হবে। এই অর্থায়ন কিভাবে করতে হবে সেটার উপায়ও বলে দেয়া হয়েছে, তা হলো : বেতন-ফি বৃদ্ধি, ভর্তুকি কমানো, নতুন হল নির্মাণ না করা ইত্যাদি।

অন্যদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজারীকরণের ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণি এগুচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তৈরি করা কুখ্যাত 'উচ্চশিক্ষার কৌশলপত্র ২০০৬-২০২৬'-এর আলোকে। যেটি তৈরি করা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের নীতি, পরামর্শ ও অর্থায়নে। বর্তমানে চলছে এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মধ্যমেয়াদি পর্ব। এই কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ২০২৬ সালের মধ্যে তাদের মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ নিজেদের অর্থায়নে করতে হবে। এই অর্থায়ন কিভাবে করতে হবে সেটার উপায়ও বলে দেয়া হয়েছে, তা হলো : বেতন-ফি বৃদ্ধি, ভর্তুকি কমানো, নতুন হল নির্মাণ না করা ইত্যাদি। একই সঙ্গে এও বলে দেয়া হয়েছে যে প্রাধান্য দিতে হবে বাজারি বিষয়গুলোতে। বন্ধ করতে হবে ছাত্র রাজনীতি। ক্যাম্পাসে তৈরি করতে হবে ক্যাম্পাস পুলিশ। ইতোমধ্যেই এ কৌশলপত্রের আদেশ শিরোধার্য মেনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্রমাগত বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন ফির পরিমাণ। ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সান্ধ্য কোর্স চালুর প্রবণতা। হলগুলোতে কমানো হচ্ছে ভর্তুকি। নতুন তৈরি হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইচ্ছেমতো আদায় করা হচ্ছে বেতন। বাড়ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার করার প্রবণতাও। যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে এখনো তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাজারীকরণ করতে পারেনি, কিন্তু তাদের তরফ থেকে চেষ্টা যে অব্যাহত আছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটা গত কয়েক বছরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে পরিষ্কার। এক্ষেত্রে তীব্র ছাত্র আন্দোলন এড়াতে কৌশলপত্রের পরামর্শ অনুযায়ীই এগুনো হচ্ছে 'ধীর লয়ে' কিন্তু ধারাবাহিকভাবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি কী বলছে

জনগণের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি দেশের শাসকশ্রেণির দর্শন ফুটে ওঠে তাদের তৈরি করা শিক্ষানীতিতে। বাংলাদেশের শিক্ষানীতিও তার ব্যতিক্রম নয়। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ পড়লে দেখা যাবে, এর নানান জায়গায় নানাভাবে শিক্ষার বাজারীকরণ করার কথা বলা হয়েছে। কোথাও সরাসরি, কোথাও আবার নানা রকমভাবে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে।

শিক্ষানীতির শুরুতেই মুখবন্ধে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, "শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা ও বিনিয়োগ গুণগতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের জন্য বিনিয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।"

শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের অতীত ইতিহাস মাথায় রাখলে এটা বলা অনুচিত হবে না যে এই বক্তব্য দ্বারা কার্যত শিক্ষাকে আরো বেশি করে বেসরকারি খাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে এটাও দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার আসল কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটানো। শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা নয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে, "বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।" একটা বাজারীকৃত শিক্ষাব্যবস্থায় যেখানে শিক্ষা কার্যত বাজার থেকে কিনে নিতে হচ্ছে পরোক্ষভাবে, সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ রাখার কথা বলার অর্থ কী? সমান সুযোগ থাকলেও গরিবের সন্তান সেই সুযোগের ব্যবহার করতে সক্ষম হবে কিভাবে? তাছাড়া শিক্ষা তো শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষকের উপরই নির্ভর করে না। নির্ভর করে শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও। যেখানে গরিবের সন্তানরা পারিবারিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে ধনীর সন্তানদের থেকে খারাপ অবস্থায় থাকে, সেখানে তাদের জন্য দরকার ধনীর সন্তানদের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ-সুবিধা, যাতে তারা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ধকল কাটিয়ে শিক্ষাগ্রহণ চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা না করে 'সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা'–এই ধরনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড মার্কা বক্তব্য শুনতে যতই মহৎ শোনা যাক না কেন কার্যত প্রহসন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে আরো বলা হয়েছে, "সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।" এক্ষেত্রে শিক্ষার বিভিন্ন ধারা বজায় থাকলে কী করে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা যায় সেটি একটি প্রশ্ন হলেও উপরের বক্তব্যে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা দরকার তা হলো বাজারের তৈরি করা শিক্ষার বিভিন্ন ধারার যে নৈরাজ্যিক ব্যবস্থা বর্তমানে আছে, সেটিকেই বজায় রাখা হয়েছে এবং বৈধতা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এই তিন ধারা বজায় রাখার মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি খাতের অংশ আরো বেশি করে বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঠিক একই রকমভাবে সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের বদলে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অংশে শিক্ষার বিভিন্ন ধারার মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে আরো বলা হয়েছে, 'শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা'। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার হতে হবে কেন? এটা নিচের স্তরে বাস্তবে কতটা উপযোগী? প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকাশনা Bangladesh Primary Education Annual Sector Performance Report (ASPR-2012)-এর তথ্যানুসারে, দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ২৬ শতাংশ আর বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ৩২ শতাংশ বিদ্যালয়ে সামান্য চক বোর্ডের ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত করা যায়নি। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো না মিটিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর এত জোর দেয়া হচ্ছে কাদের স্বার্থে? এভাবে কাদের মুনাফা বানানোর নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার দরকার আছে। অন্যদিকে এই শিক্ষানীতিতে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আলাদা অধ্যায় আছে, ধর্ম শিক্ষা নিয়ে আলাদা অধ্যায় আছে, কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম হাতিয়ার যে ল্যাবরেটরি সেটা নিয়ে কোনো অধ্যায়ই নেই! এমনকি বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে যে অধ্যায়টি আছে সেখানে মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক ক্লাসের ব্যবস্থা করার কথা বলা হলেও প্রতিটি স্কুল ও কলেজে ল্যাবরেটরি স্থাপনের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এভাবে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ের চর্চাকে বাদ দিয়ে কেবল তথ্যপ্রযুক্তির উপর জোর দেয়ার কারণ কী? কারণ হলো বাংলাদেশের বাজারে এখন তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ লোকের চাহিদা আছে। এভাবে বিজ্ঞানের মৌলিক চর্চাকে বাদ দিয়ে কেবল তথ্যপ্রযুক্তির উপর জোর দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষাকে স্রেফ বাজারের চাহিদার অধীন করে তোলার ব্যবস্থাই শাসকশ্রেণি করেছে।

অন্যদিকে শিক্ষানীতিতে শিক্ষাকে কেবল দেশীয় বাজারের চাহিদার অধীনই করা হয়নি, উপরন্তু বিদেশের বাজারের চাহিদারও অধীন করা হয়েছে। প্রকৌশল শিক্ষা অংশে বলা হয়েছে, "বর্তমান প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী সরবরাহ করার জন্য প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলোতে প্রয়োজনে একাধিক শিফটে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হবে।" এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, এদেশের জনগণের বিপুল অর্থ ব্যয় করে এসব প্রকৌশলী তৈরি করা হবে বিদেশি রাষ্ট্রকে সেবা দেয়ার জন্য! অর্থাৎ এদের তৈরি করার যাবতীয় খরচ বহন করবে এদেশের জনগণ আর তৈরি হওয়ার পর ফলটা খাবে অন্য রাষ্ট্র।

উচ্চশিক্ষার অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হবে। সরকারি অনুদান ছাড়াও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীর বেতন ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যক্তিগত অনুদান সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে। এতে অসচ্ছল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। অসচ্ছলতা প্রমাণের মূল দায়িত্ব অভিভাবকের উপর ন্যস্ত থাকবে তবে তার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি প্রণয়ন করা হবে।" বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রস্তুত করা উচ্চশিক্ষার যে কুখ্যাত কৌশলপত্রটি আছে, তার বক্তব্যের সাথে শিক্ষানীতির বক্তব্যের খুব বেশি পার্থক্য আছে কি? কাজেই এটা পরিষ্কার যে, এই শিক্ষানীতি শিক্ষাকে আরো বেশি করে বাজারের হাতে তুলে দেয়ার পথই প্রশস্ত করেছে।

শিক্ষার বাজারীকরণের ফলাফল

এবার দেখা যাক শিক্ষাকে সর্বস্তরে এভাবে বাজারের হাতে তুলে দেয়ার ফলাফল হিসেবে বর্তমানে এদেশের শিক্ষা খাতে কী ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। নতুন কী ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সর্বোপরি বাজারীকরণের পর শিক্ষা খাত কেমন চরিত্র

ধারণ করেছে।

নৈরাজ্য : একদিকে শিক্ষার ব্যাপারে সরকারগুলোর হাত গুটিয়ে বসে থাকা, অন্যদিকে শিক্ষাকে ক্রমাগত বাজারের হাতে তুলে দেয়ার প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে বাজার এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে তৈরি করেছে এক গভীর নৈরাজ্য। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে তিন ধারার ১৪ রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু আছে। এগুলো হলো : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি অনিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়, এবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয়, দাখিল মাদ্রাসা সংযুক্ত এবতেদায়ি অংশ, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক অংশ, ব্র্যাক সেন্টার, আরওএসসি বিদ্যালয়, শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অন্যান্য। অন্যদিকে রয়েছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এগুলোর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যলয়গুলোর কারিকুলাম এক রকমের। কিন্ডারগার্টেনগুলোর কারিকুলামে আবার সরকারি কারিকুলামের পাশাপাশি ইচ্ছেমতো নতুন বিষয় সংযোজন চলে। অলিতে-গলিতে গজিয়ে ওঠা এসব কিন্ডারগার্টেনে বাস্তবে কী পড়ানো হচ্ছে সে বিষয়ে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। মাদ্রাসাগুলোর কারিকুলাম আরেক ধরনের। বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত প্রাথমিক অংশগুলোর কারিকুলামে আবার স্কুলভেদে ভিন্নতা থাকে। এনজিও পরিচালিত স্কুল আবার পরিচালিত হয় ভিন্ন আঙ্গিকে। অন্যদিকে মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়েও তিন ধারার শিক্ষা তো আছেই। মাদ্রাসা ধারায় আবার এখন প্রাধান্য তৈরি হয়েছে কওমি মাদ্রাসার, যেগুলোর উপর রাষ্ট্রের কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণই নেই।

একদিকে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাকে যেমন পুরোপুরি বাজারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে সেই শিক্ষাবাজারের উপর রাখা হয়নি কোনো নিয়ন্ত্রণ। ফলে স্কুল ও কলেজ শিক্ষার বাজারে এখন শাসনক্ষমতার সাথে সংযুক্ত লোকদের সর্বগ্রাসী লুণ্ঠনের অভিপ্রায় ও দুর্নীতির সুযোগে শুরু হয়েছে ফাটকা ব্যবসা। বাজারে এখন কোচিং সেন্টার বাণিজ্য, নোট বইয়ের বাণিজ্যের পাশাপাশি প্রশ্ন বাণিজ্য শুরু হয়েছে। যার ফলাফল হলো সাম্প্রতিক ইন্টারমিডিয়েটসহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাগুলো। এ প্রশ্ন ওঠাটা খুব সংগত যে, কেন সাম্প্রতিক প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাগুলোর কোনো বিচার হলো না। এমনকি তদন্তে কারা জড়িত, সেটাও বের হলো না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাজার নৈরাজ্য তৈরি করছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে, যেগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনো রকম মানের তোয়াক্কা না করে সরাসরি শিক্ষার্থীদের উচ্চ মুনাফার ক্ষেত্রে পরিণত করা।

বৈষম্য : জনগণের শিক্ষাকে সরাসরি বাজারের হাতে তুলে দেয়ার আরেকটি ফলাফল হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া প্রকট বৈষম্য। এই বৈষম্য দিন দিন প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এক্ষেত্রে কেবল সাম্প্রতিক অবস্থাটা দেখা যাক। Bangladesh Education Statistics 2012-এর তথ্যানুসারে, মোট প্রাথমিকে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ৭৮ শতাংশই পড়াশোনা করছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। এই বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকাশনা Bangladesh Primary Education Annual Sector Performance Report (ASPR-2012) কী বলছে সেটা দেখা যাক। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ৭৮ শতাংশ আর বেসরকারি রেজিস্টার্ডগুলোর মধ্যে ৮০ শতাংশ বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষপ্রতি শিক্ষার্থীসংখ্যা ৪০ জনের বেশি। ৫৬ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৮ শতাংশ বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুযায়ী শিক্ষার্থীপ্রতি পর্যাপ্ত জায়গা নেই। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মাত্র ৫৫ শতাংশ আর বেসরকারি রেজিস্টার্ডগুলোর মধ্যে ৫৩ শতাংশে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত স্বীকৃত মানদণ্ড থেকে বেশি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলোর মধ্যে ৬৭ শতাংশ এবং বেসরকারিগুলোর ৪৯ শতাংশ পাকা এবং ভালো অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ২৬ শতাংশ আর বেসরকারি রেজিস্টার্ডগুলোর ৩২ শতাংশ শ্রেণিকক্ষের মধ্যে চক বোর্ডের ব্যবস্থাই নেই। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২ শতাংশ আর বেসরকারি রেজিস্টার্ডগুলোর মধ্যে ৫ শতাংশের কোনো শৌচাগার নেই। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচাগার রয়েছে মাত্র ৫১ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৪০ শতাংশ বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১২ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ১৭ শতাংশ বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির ব্যবস্থা নেই। নলকূপের পানির ব্যবস্থা থাকা স্কুলগুলোর মধ্যে ৯-১১ শতাংশে স্কুলে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে।

উপরে ৭৮ শতাংশ শিক্ষার্থীর স্কুলগুলোর যে বেহাল দশার বিবরণ দেয়া হলো সেটা হলো গড়পড়তা অবস্থা। প্রান্তিক অবস্থানে থাকা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা যে আরো কতটা ভয়াবহ তার বিবরণ প্রতিনিয়তই উঠে আসে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। জনগণের সন্তানদের স্কুলগুলোর এই ভয়াবহ অবস্থার বিপরীতে এদেশেই চালু থাকা শীর্ষস্থানীয় কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের খবর নেয়া যাক, যেগুলোতে পড়াশোনা করে শাসক শ্রেণিভুক্তদের সন্তানরা।

বারিধারার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটি সাড়ে চার একর জমির উপর অবস্থিত। স্কুলে যা যা রয়েছে তা হলো : ইন্টারনেট সুবিধাসহ ৬০টি শ্রেণিকক্ষ, দুটি গ্রন্থাগার, চারটি কম্পিউটার ল্যাব, ছয়টি আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণাগার, তিনটি ব্যায়ামাগার, একটি ভারোত্তোলন কেন্দ্র, ছাত্রকেন্দ্র, নার্সদের ক্লিনিক, মানসিক সহায়তা দেয়ার কার্যালয়, কলা ও সংগীত চর্চার সুবিধাসহ অত্যাধুনিক একটি মিলনায়তন, দুটি খেলার মাঠ, একটি অ্যাথলেটিক চর্চার মাঠ। এর পাশাপাশি স্কুলটিতে একটি হিটেড সুইমিংপুলও আছে। ধানমণ্ডির অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটিতে যা যা রয়েছে তা হলো : ইন্টারনেট সুবিধাসহ শ্রেণিকক্ষ, পাঁচটি কম্পিউটার ল্যাব, তিনটি আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণাগার, ১০ হাজার বইসমৃদ্ধ লাইব্রেরি, চিকিৎসাসেবা, মিলনায়তন ও ক্যাফেটেরিয়া, খাওয়ার পানির ব্যবস্থা হিসেবে আছে মিনারেল ওয়াটার। এছাড়া শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস। এসব তথ্য রয়েছে স্কুলগুলোর ওয়েবসাইটে। এমন উদাহরণ আরো দেয়া যায়। তালিকায় আরো যুক্ত করা যায় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকাসহ আরো কিছু স্কুলকে।

এসব স্কুলের সাথে কি কোনো তুলনা চলতে পারে জনগণের স্কুলগুলোর? আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে কেবল প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হতেই লাগে ১০ লাখ টাকারও বেশি। ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকায় প্রাথমিকে ভর্তি ফি প্রায় চার লাখ ৩৫ হাজার টাকা। এসব তথ্যও স্কুলগুলোর ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য

থেকে হিসাব করলে জানা যায়। হিসাব করলে দেখা যাবে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একজন শিক্ষার্থীর সারা বছরের টিউশন ফি দিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষককে সারা বছর ধরে বেতন দেয়া যাবে। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই বিপুল পরিমাণ বৈষম্যই বাজার শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে।

তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর অবস্থা শীর্ষস্থানীয়গুলোর মতো না হলেও সেগুলোতে খরচের বহর খুব একটা কম নয়। ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে ভর্তি ফি স্কুলভেদে ৬০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। মাসিক বেতন ওঠানামা করে তিন হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৫৭ হাজার টাকার মধ্যে। (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩)। যেগুলোতে সরকারি হিসাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ১০।

শিক্ষার মানের ক্রমাগত অবনমন

বাংলাদেশে শিক্ষার এই লাগামছাড়া বাজারীকরণের আরেকটি ফলাফল হচ্ছে শিক্ষার মান ক্রমাগত নিচে নেমে যাওয়া। এটি একদিকে যেমন শিক্ষার দায়িত্ব সরাসরি বাজারের হাতে তুলে দেয়ার ফলে ঘটছে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের অতি নিম্নমানের নোট-গাইডসহ কোচিং বাণিজ্যের কাছে জিম্মি করে রাখার কারণেও ঘটছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজার কেমন লেজে-গোবরে অবস্থা পাকিয়েছিল তার একটা নমুনা হলো ১৯৯১ সাল থেকে চলে আসা বেসরকারি রেজিস্টার্ড ও নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের আন্দোলন। ২০১৩ সালে জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়া এসব বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা সরকারিগুলোর থেকে কতটা খারাপ ছিল তা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের Primary Education Annual Sector Performance Report (ASPR-2012)-তে বিস্তারিত আছে, যার কিছু উল্লেখ উপরে করা হয়েছে।

অন্যদিকে গত ১২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত 'সংখ্যাসূচকের বিস্ফোরণ ঘটলেও মান নিয়ে প্রশ্ন : চ্যালেঞ্জের মুখে শিক্ষা' শীর্ষক প্রতিবেদনটি তথ্য দিচ্ছে : মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা SESDP-এর মূল্যায়ন অনুসারে, বর্তমানে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৪ শতাংশেরও কমসংখ্যক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত। যদিও এই মূল্যায়ন মূলত স্কুলগুলোর নিজস্ব মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা এর থেকেও খারাপ হওয়া বিচিত্র নয়। মনে রাখা দরকার, ২০১২ সালের পরিসংখ্যানের হিসাবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৯৮ শতাংশই বেসরকারি। জনকণ্ঠের উক্ত প্রতিবেদনটি আরো তথ্য দিচ্ছে : বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন 'সিডিল ফার্টাইল গ্রাউন্ড : এডুকেশন দ্যাট ওয়ার্কস ফর বাংলাদেশ' অনুসারে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ বাংলাতেই দক্ষ নয়। গণিত ও ইংরেজির অবস্থা আরো খারাপ। অন্যদিকে তিন বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ৮০ শতাংশ পাশই করতে পারছে না। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ে ভর্তির আবেদন করার যোগ্যতা হিসেবেই এসএসসি আর এইচএসসি মিলিয়ে সবচেয়ে ভালো রেজাল্টের অধিকারী হতে হয়। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১১ সালের অনার্স পার্ট-১ পরীক্ষায় ৪৬ শতাংশই ফেল করেছে। সরকার পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ক্রমবর্ধমান পাসের হার আর জিপিএ ৫-এর বন্যা নিয়ে যতই গর্ব করুক না কেন, উপরের তথ্যগুলোই বলে দিচ্ছে, বাজারীকৃত শিক্ষার সাধারণ মানের অবস্থাটা আসলে কী। এক্ষেত্রে এসব পাবলিক পরীক্ষার রেজাল্টের উপর সরকারি হস্তক্ষেপের যে 'ওপেন সিক্রেট' মানুষ জানে, সেটাকেও বিবেচনা করলে শিক্ষার মানের অবস্থা কতটুকু সঙ্গিন সেটা আরো বেশি করে টের পাওয়া যায়। এদিকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান যে কেমন সে সম্পর্কে টিআইবির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনটি ভালোভাবেই ইঙ্গিত দেয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সনদ বাণিজ্যের কথা পত্রিকায় কম আসে না।

বাজারীকৃত শিক্ষা জনগণের গড়পড়তা শিক্ষার মানকে এতটাই নিচে নামিয়ে তুলেছে যে, ২০১৩ সালের মে মাসে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Literacy Assessment Survey 2011 অনুসারে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৬.৩ শতাংশ মানুষই কার্যত নিরক্ষর। অর্থাৎ দেশের ৭ কোটি ১১ লাখেরও বেশি মানুষ কার্যত কোনো বাক্য লিখতে ও পড়তে পারে না, পাটিগণিতের ৪টি মৌলিক কাজ : সাধারণ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে জানে না এবং প্রাত্যহিক জীবনে এই দক্ষতাগুলো কাজে লাগাতে পারে না। ইউনিসেফের ২০০৯ সালের Quality Primary Education in Bangladesh শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে পঞ্চম শ্রেণি পাস করা শিক্ষার্থীদের মাত্র অর্ধেক অংশ জাতীয় কারিকুলাম নির্ধারিত ন্যূনতম মান অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে সরকার প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির হার বৃদ্ধি নিয়ে যতই গর্ব করুক, বাস্তবতা হচ্ছে, এখনো ঝরে পড়া কার্যকরভাবে কমিয়ে আনা যায়নি। Bangladesh Education Statistics 2012-এর তথ্য অনুসারে, প্রাথমিকে ভর্তির হার এখন ৯৬.৭ শতাংশ হলেও এদের মধ্যে ২৯.৭ শতাংশ বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণিতে ঝরে পড়ছে।

শিক্ষার ধর্মীয়করণ

বাজারের হাতে শিক্ষাকে তুলে দেয়ার আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো শিক্ষার ধর্মীয়করণ। তবে এই ধর্মীয়করণ কেবল বাজারের একার সৃষ্টি নয়। শাসকশ্রেণি ও তাদের আন্তর্জাতিক প্রভুদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে শিক্ষার ধর্মীয়করণ জিইয়ে রাখার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে শাসকশ্রেণি ও তাদের প্রভুদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি, অন্যদিকে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাকে পুরোপুরি বাজারের হাতে তুলে দেয়ার অন্যতম ফলাফল হিসেবে বাজার এখানে তৈরি করেছে বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসা, যেগুলোর পাঠ্যক্রম সবচেয়ে পশ্চাৎপদ।

ব্যানবেইসের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দেশে সকল পর্যায়ের সরকার স্বীকৃত আলিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯৮টি। সেখান থেকে শুরু করে ২০১২ সালে এসে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন মাদ্রাসার সংখ্যা সংখ্যা দাঁড়িছেছে ৯,৪৪১টিতে। সেগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটি সরকারি, বাকি সবগুলোই বেসরকারি। অর্থাৎ ৪০ বছরে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২৪ গুণ। শুধু দাখিল আর আলিম মাদ্রাসার হিসাব নিলে মাদ্রাসা বেড়েছে ২০ গুণ। একই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় বেড়েছে তিন গুণ, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেড়েছে প্রায় আড়াই গুণ, ইন্টামিডিয়েট কলেজের সংখ্যা বেড়েছে ৭ গুণ। অবশ্য ১৯৭৬ সালের সাথে ২০১২ সালের তুলনা করলে মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসবে। কিন্তু তার পরও সেটি এই সময়ের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের সংখ্যা যত গুণ বেড়েছে তার থেকে বেশি হবে। ১৯৭৬-২০১২ সময়ে দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে ৭ গুণেরও বেশি।

স্কুল পর্যায়ের শিক্ষায় রাষ্ট্রের অবহেলার কারণেই গত ৪০ বছরে দেশে গড়ে উঠেছে বিপুলসংখ্যক কওমি মাদ্রাসা। এগুলোর সঠিক সংখ্যা নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি। ২০১৩ সালের এপ্রিলে কওমি মাদ্রাসা কমিশন তাদের প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছিল, সেটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে অবস্থানপত্র তৈরি করে, সেখানে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ২৪ হাজারের কিছু বেশি (কালের কণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০১৩)। তবে প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। কেননা গত তিন বছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০ হাজারের মধ্যে ওঠানামা করেছে, যেগুলোতে শিক্ষার্থীসংখ্যা ১৪ লাখ থেকে ৪০ লাখের মধ্যে ওঠানামা করেছে। ইদানীং আবার মাদ্রাসার বাজারীকরণের অংশ হিসেবে ব্যয়বহুল ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা, ক্যাডেট মাদ্রাসা ইত্যাদিও গড়ে উঠেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসা বাজারে গড়ে উঠছে কেন? কেন গরিব মানুষেরা তাদের সন্তানদের এসব মাদ্রাসায় পাঠায়? গরিবের সন্তানরা কেন এসব মাদ্রাসায় পড়ে থাকতে বাধ্য হয়? তার প্রধান কারণ এই রাষ্ট্র তাদের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক স্কুলের ব্যবস্থা করেনি, এতিমদের ভরণপোষণের জন্য কার্যত কোনো ব্যবস্থা করেনি, তাদের আশ্রয় দেয়া, নিরাপত্তা দেয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি। আর রাষ্ট্রের এই অবহেলার সুযোগে এবং সেই সাথে শিক্ষাকে বাজারের হাতে তুলে দিয়ে বাজারকে তার মর্জিমাফিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষমতা দিয়ে রাখার ফলে মাদ্রাসাগুলো এত বিপুল সংখ্যায় গড়ে উঠতে পারছে এবং টিকে থাকতে পারছে। এই রাষ্ট্র যদি সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এই অংশের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযোগী স্কুলের ব্যবস্থা করে, তাদের বেতন, বই ছাড়াও শিক্ষার অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়গুলো বহন করে, এতিম ও অতি অসহায়দের জন্য ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে, তাদের নিরাপত্তা ও আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করে, যাতে এই শিশুদের আর পশ্চাৎপদ শিক্ষার মাদ্রাসাগুলোতে পড়তে না হয়, তাহলে সেটা নিয়ে জনগণ আপত্তি জানাবে কি? তখনো কি তারা তাদের সন্তানদের এসব মাদ্রাসায় পাঠাবে?

যেখানে স্বাধীনতার পর পর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিলে তৎকালীন অতি অল্পসংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে অতি সহজেই মূলধারার শিক্ষায় পুনর্বাসিত করা যেত, সেখানে সেই উদ্দেশ্যে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে মাদ্রাসাগুলোকে এত বিপুল সংখ্যায় বাড়তে দিয়ে চার দশক পর এসে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে 'মাদ্‌রাসা শিক্ষা' অংশে বলা হচ্ছে, "বর্তমানে মাদ্‌রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে এ শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।" শাসকশ্রেণির যে সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একমুখী শিক্ষা চালু করার কোনো ইচ্ছাই নেই, উল্টো এই মাদ্রাসা শিক্ষার পালে উত্তরোত্তর হাওয়া বৃদ্ধির ইচ্ছা আছে তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে কি?

কী ঘটবে যদি গ্রামে গ্রামে মানুষকে সংগঠিত করা যায় তাদের সন্তানদের জন্য মানসম্মত বিদ্যালয়ের দাবিতে? কী ঘটবে যদি স্কুলে স্কুলে, কলেজে কলেজে শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করা যায় ল্যাবরেটরির দাবিতে, লাইব্রেরির দাবিতে? কী ঘটবে যদি ঢাকা শহরে বস্তির মানুষেরা মিছিল শুরু করে তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার দাবিতে? কী ঘটবে যদি এলাকার মানুষকে সংগঠিত করা যায় স্কুল থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করার জন্য?

কী ঘটবে যদি...?

বাংলাদেশে সর্বগ্রাসী বাজারীকরণের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষার উচ্ছেদ ঘটছে, নৈরাজ্য ও মানের অধঃপতন বিস্তার ঘটাচ্ছে কুশিক্ষার। অন্যদিকে বাজারীকরণের ফলে শিক্ষার মান যে হারে নামছে, এর ফলে শিক্ষিতদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি।

বাংলাদেশে শিক্ষার এই বাজারীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার সর্বত্র। তবে বাজারীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন যে একেবারেই হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আন্দোলন বা প্রতিবাদ আবর্তিত হচ্ছে কেবল উচ্চশিক্ষাকে ঘিরে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, যেখানে বাজারীকরণের প্রধান শিকার নিম্নবিত্ত জনগণের সন্তানরা, যেখানে বাজারীকরণের প্রধান শিকার স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা, সেখানে বাজারীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময় প্রাধান্য দিতে হবে নিম্নবিত্ত জনসাধারণকেই। প্রাধান্য দিতে হবে স্কুল ও কলেজকেই। কী ঘটবে যদি গ্রামে গ্রামে মানুষকে সংগঠিত করা যায় তাদের সন্তানদের জন্য মানসম্মত বিদ্যালয়ের দাবিতে? কী ঘটবে যদি স্কুলে স্কুলে, কলেজে কলেজে শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করা যায় ল্যাবরেটরির দাবিতে, লাইব্রেরির দাবিতে? কী ঘটবে যদি ঢাকা শহরে বস্তির মানুষেরা মিছিল শুরু করে তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার দাবিতে? কী ঘটবে যদি এলাকার মানুষকে সংগঠিত করা যায় স্কুল থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করার জন্য? কী ঘটবে যদি শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামে ভুলে ভরা নিম্নমানের পাঠ্যবই প্রত্যাখ্যান করার জন্য? কী ঘটবে যদি শিক্ষার্থীরা একগাদা অপ্রয়োজনীয় বিষয় গিলতে একযোগে অস্বীকার করে বসে? এ ধরনের আরো অনেক দাবিতে জনগণকে কিভাবে সংগঠিত করা যায়, সেসব প্রশ্নের উত্তর বের করাই এখন এদেশের পরিবর্তনকামী মানুষের জন্য সবচেয়ে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাহতাবউদ্দীন আহমদ: লেখক ও গবেষক
ইমেইল: m21ahmed@yahoo.com